সিডনির মিলন মেলা ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

আরিফুর রহমান খাদেম

আজ থেকে প্রায় ১৩/১৪ বছর আগের কথা। তখন আমি সিডনিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুল-টাইম ছাত্র। পড়াশুনার পাশাপাশি পার্ট-টাইম কাজ করার বাইরে জীবন অনেকটা সূর্যাস্তের মতই মলিন ছিল। স্বপ্নের দেশে আসা সত্ত্বেও মনে খুব বেশি একটা আনন্দ ছিল না। কারণ তখন একদিকে দেশের মায়া ছাড়তে পারছিলাম না, অন্যদিকে নিজের মধ্যে অজি অজি ভাবও আনতে পারছিলাম না। একই সাথে নিজেকে পুরোপুরি এদেশের খাবার ও কালচারের সাথেও খাপ খাইয়ে নিতে পারছিলাম না। তাছাড়া তখন সিডনিতে বাংলাদেশির সংখ্যাও ছিল খুব কম, ফলে দেশীয় খাবারও বাঘের দুধের মতই দুষ্প্রাপ্য ছিল। এখন ল্যাকেম্বার যে কোনো প্রান্তে দাঁড়িয়ে বা ব্যাংকস্টাউন অথবা ইলাওয়ারা লাইনের কোনো ট্রেনে উঠে যদি কেউ মাঝারি আওয়াজেও বাংলায় ডাক তোলে, কমপক্ষে দুয়েকজন বাংলাদেশি হলেও এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করতে পারে, 'কি হয়েছে, ভাই? এভাবে চেঁচাচ্ছেন কেন? কোনো সমস্যা?' ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি এ দেশে আসার পর আমার সাথে হাতে গোনা যে কয়জন বাংলাদেশির সাথে পরিচয় হয়েছিল, তাদের বেশিরভাগের মধ্যেই দেশীয় সংস্কৃতির চেয়ে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রতি ঝোক ছিল বেশি। ফলে সিডনিতে কি হচ্ছে না হচ্ছে ওই কর্মকাণ্ডগুলো জানার বা বুঝার সৌভাগ্য হয়নি। এ দেশের মাটিতেও বিশাল আয়োজনে আমাদের কৃষ্টি-কালচারের উপর ভিত্তি করে মেলা বা এ জাতীয় কোনো অনুষ্ঠান হতে পারে জানা ছিল না। এক-দেড় বছর যেতে না যেতেই আমার সমবয়সী কিছু দেশপ্রেমিক বাংলাদেশির সাথে পরিচয় হয়। তাদের সূত্র ধরেই সিডনির বারউড গার্লস স্কুলে বৈশাখী মেলায় প্রথম যাত্রা। মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশের প্রায় অর্ধ থেকে এক কিলোমিটার আগেই বাংলাদেশ বাংলাদেশ একটা গন্ধ পাচ্ছিলাম। অর্থাৎ ওই এলাকার আকাশে বাতাসে এমন একটা পরিবেশ বিরাজ করছিল, যে কোনো সত্যিকার বাংলাদেশিকে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবেনা যে কিছুদূর পর ফেলে আসা বাংলাদেশকে আবার দেখতে পাব। প্রাণ খুলে একই স্থানে হাজার হাজার বাংলাদেশির সাথে কথা বলতে পারব। হরেক রকম দেশীয় স্বাদের খাবার গ্রহণ করতে পারব। হারানো দিনের গানসহ দেশীয় ব্যান্ডের আয়োজনে দিনভর গান শুনতে পাব। বয়সের দোষেই হোক আর পরিবেশের কারণেই হোক; মনে, প্রাণে ও ধ্যানে তখন সব সময়ই তারুণ্যের হাওয়া বইতো। তাই মেলার দ্বারে পৌঁছা মাত্রই বিখ্যাত সেই গানটি বাস্তবে

অবলোকন করলাম, আর মনে ধ্বনিত হচ্ছিল: 'মেলায় যাই রে----------বাসন্তি রং শাড়ি পড়ে ললনারা হেটে যায়'। দুপুর ১২ থেকে রাত প্রায় ১০ পর্যন্ত মেলা প্রাঙ্গণে তিল ধারণের ঠাই ছিলনা। সবার মুখেই ছিল একটা অন্য রকম হাসি ও আনন্দের উচ্ছ্বাস। মনে হয়েছে বৃহৎ একটা ৫১বর্তী পরিবার বহুদিন পর মিলিত হল।

হাটি হাটি পা পা করে এ মেলা বিশ বছরে পা রাখল। বারউডে যাত্রা শুরু করে গত কয়েক বছর ধরে এ মেলা স্থায়ী নিবাস গড়েছে আন্তর্জাতিক ভেন্যু ও ২০০০ সালে সিডনিতে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক অলিম্পিক পার্কের এথলেটিক গ্রাউন্ডে। একই সাথে অত্যন্ত সফলতার সাথে এ মেলা স্থান করে নিয়েছে হাজার

হাজার বাংলাদেশির হৃদয়ে। ফলে এ মেলা অস্ট্রেলিয়া-ব্যাপী বিভিন্ন নামে পরিচিত। অধিকাংশই এ মেলাকে 'মিলন মেলা' বলে আখ্যায়িত করেছেন; আবার কেউ কেউ একে সিডনির 'প্রাণের মেলা' বলে থাকেন। কারণ এ মেলায় ছোট একটি দুধের শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই দলমত ও ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে ভেদাভেদ ভুলে অংশগ্রহণ করে। একই সাথে যোগ দেয় অস্ট্রেলিয়ানসহ ভিন দেশীয় অনেকেই। এ মেলার মাধ্যমে এক বন্ধু তার হারানো বন্ধুকে খুঁজে পায়। সিডনির ব্যস্ত জীবনে যেসব পরিচিত জন একে অন্যের সান্নিধ্যে আসার সময়টুকু বের করে নিতে পারেনা, এ মেলায় সে সুযোগ ঘটে। অর্থাৎ এ মেলার মাধ্যমে পরিচিত প্রায় সবার সাথেই সবার দেখা হয়। সাধারণ মানুষ মেলাটি সপরিবারে উপভোগ করতে অনেক আগে থেকেই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। যাদের বাধ্যতামূলকভাবে শনিবার কাজ করতে হয়, তারা আগেভাগেই ছুটি নিয়ে নেয়। এ মেলা সিডনির প্রাণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হলেও, অস্ট্রেলিয়ার দূরপাল্লার শহর ক্যানবেরা, ম্যালবোর্ণ ও ব্রিসবেনসহ সিডনির বাইরের বিভিন্ন শহর থেকেও মেলা পাগল কিছু বাংলাদেশি শুধুই প্রাণের টানে ছুটে আসে সিডনিতে। এ বছর এ মেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ২১ এপ্রিল শনিবার বেলা ১১ থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত।

অন্যদিকে, আমি এ মেলাকে ডাকি সিডনির 'আত্মার মেলা' বলে। কারণ এ মেলার সাথে আত্মার একটা সুসম্পর্ক আছে। এ মেলার একটা বড় গুনাগুণ হচ্ছে, মেলা প্রাঙ্গণে বেলা শুরুর অনেক আগে থেকেই মানুষের ঢল নামে। বিকেল গড়ার আগেই অলিম্পিক ভেন্যু হয়ে উঠে লোকে লোকারণ্য। ছোটখাটো একটা উৎসবের নগরীতে পরিণত হয়, যা আমাকে অপেরা হাউজ বা ডার্লিং হার্বারে উদযাপিত ইংরেজি নববর্ষের কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। গত বছরের টিকিট বিক্রির রেকর্ড অনুযায়ী প্রায় বিশ হাজার লোকের উপস্থিতি ঘটেছিল। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, টিকিট বিহীন শিশুসহ ওই সংখ্যা ২৫ হাজারের কৌটায় দাঁড়াতে পারে। দীর্ঘ একটা দিন কিভাবে রাত দশটা পর্যন্ত কেটে যায় বুঝার উপায় নেই। ঝড়-বৃষ্টির কোনটাই মেলার গতি রোধ করতে পারে না। প্রায় দেড় শতাধিক দেশীয় কাপড় ও খাবারের রকমারি স্টল, শিশুদের মনোরঞ্জনে ১০/১৫টি রাইড এবং সিডনির জনপ্রিয় সংগীত, ব্যান্ড, অভিনয় ও শিশুশিল্পীদের অংশগ্রহণে দিনভর চলে এক মহা-উৎসব। তাছাড়া দেশীয় বস্ত্র পরিধানে বিশেষ আয়োজন ফ্যাশন শো ও বাংলাদেশ থেকে আগত নামকরা শিল্পীর গানও মেলাকে আরও আকর্ষণীয় করে। একই সাথে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে ফায়ার ওয়ার্কসের প্রদর্শনীও মনে রাখার মত। এ মেলা শুরুর আগ থেকে শেষ পর্যন্ত অন্য রকম একটা অনুভূতি কাজ করে যা সিডনিতে অনুষ্ঠিত অন্য কোনো মেলায় পাইনি। ছোটবেলায় দিনভর ঈদের আনন্দের পর যখন রাত হত, নিষ্পাপ মনটি যেভাবে আবেগে-আপ্লুত হয়ে অনেকটাই ভেঙ্গে পড়ত এবং হাতছানি দিয়ে জিজ্ঞাসা করত আবার কবে খুশির ঈদ আসবে; দিন শেষে বৈশাখী মেলার দিনও মেলা প্রাঙ্গণ ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে অনেকটা একই অনুভূতি কাজ করে। যা কারও নিয়ন্ত্রণে নেই।

সিডনির মিলন মেলা বা আত্মার মেলা বৈশাখী মেলার অজস্র গুনাগুণ থাকলেও, গত কয়েক বছর ধরে এ মেলার সাথে মেলার দর্শকদের দুয়েকটা বিষয়ে বেশ মনোমালিন্য চলছে। জানিনা বিষয়গুলো মেলা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে এসেছে কিনা বা এলেও তারা এগুলোর উন্নয়নে কি ভাবছেন।

১। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে অলিম্পিক পার্কে আসলেও অনেকেই শুধুমাত্র গাড়ি পার্কিং নিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতার শিকার হয়। এ সমস্যাটি অলিম্পিক পার্কে মেলা শুরু হওয়ার পর থেকেই প্রতি বছর হয়ে আসছে। অনেকের অভিযোগ ঘণ্টার পর ঘণ্টা এদিক সেদিক ছুটাছুটি করেও পার্কিং করতে পারেনা। আবার কেউ কেউ অভিযোগ করে থাকে, মেলার জন্য বরাদ্দকৃত স্থানে পার্কিং না

পেয়ে ভিন্ন জায়গায় পার্কিং করতে গিয়ে উচ্চমূল্যে ফি দিয়ে মেলায় প্রবেশ করতে হয়। যেহেতু এটি একটি বিশাল আয়োজন, মেলায় আগত অতিথিদের আতিথেয়তাও বিশাল হতে হবে। যেহেতু প্রতি বছর উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যাচ্ছে, ওই মোতাবেক বাধ্যতামূলকভাবে পার্কিংয়ের সুব্যবস্থা করা এখন সময় ও প্রয়োজনের দাবী। একই সাথে ফিও কিছুটা কমিয়ে আনা যেতে পারে।

২। মেলায় বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে বাংলাদেশ থেকে আগত গুণী শিল্পীর পরিবেশনায় জনপ্রিয় গানের কথা ঢালাওভাবে প্রচার করা হলেও, গান পাগল মানুষ গত কয়েক বছর যাবত অনেকটা খারাপ অভিজ্ঞতা নিয়েই বাড়ি ফিরছে। বাংলাদেশ থেকে যদি মেলার উদ্দেশ্যে কোনো শিল্পী আনা হয়, তার জন্য অবশ্যই কমপক্ষে দেড় থেকে দুই ঘণ্টা বরাদ্দ করা উচিত। সময়ের অভাবের অজুহাত দেখিয়ে যদি তাকে স্টেজ থেকে দূরে রাখা হয়, তাহলে দর্শকরা সেটা কোনোভাবেই মেনে নেবে না। কারণ অনুষ্ঠান চলে দিনভর; কাজেই সেই মোতাবেক অনুষ্ঠান পরিচালকদেরও অত্যন্ত দৃঢ়তা এবং গ্রহণযোগ্য টাইম ম্যানেজমেন্টের পরিচয় দিতে হবে। কারণ আয়োজকদের এতো শ্রম ও এতো মূল্যবান সময়ের বিপরীতে বর্ণাঢ্য এ আয়োজন শুধুমাত্রই মেলায় আগত অতিথিদের জন্য। আর ওই অতিথিরাই যদি মনকষ্ট নিয়ে বাড়ি ফিরে, আমার মনে হয় না কয়েক মাসব্যাপী আপনাদের এ পরিশ্রম সার্থক হবে। আর আপনারাও এতে আত্মতৃপ্তি পাবেন। কিছু কিছু দর্শককে মন্তব্য করতে শুনেছি, পরপর গত দুই মেলায় বাংলাদেশ থেকে একই শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানানোর ব্যাপারে। তাদের মতে, দেশে কি শিল্পীর আকাল বা অভাব পড়েছে নাকি? এ প্রশ্নগুলোর সরাসরি জবাব দিতে আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে বলব, আয়োজকদের উচিত মেলা উপলক্ষে খুরশীদ আলম, সৈয়দ আব্দুল হাদী কিংবা আব্দুল জব্বারের মত শিল্পীদের আমন্ত্রণ করা। তাদের গাওয়া হারানো দিনের অসম্ভব জনপ্রিয় গানগুলো সকল প্রজন্মের দর্শকদেরই আনন্দ দিতে বাধ্য।

পরিশেষে অলিম্পিক পার্কে বৈশাখী মেলার আয়োজক বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়ার সাথে যুক্ত সকলকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই প্রায় দুই যুগ ধরে অনেক বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে এবং নিজেদের অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় করে এমন একটি গোছানো এবং সফল মেলা অস্ট্রেলিয়া-বাসীদের উপহার দিয়ে আসার জন্য। তবে তাদের প্রতি একটা বিশেষ অনুরোধ থাকবে যাতে এ মেলাকে তারা কখনো বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখেন। আশা করছি, যুগ যুগ ধরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অমর বাণী সিডনির আকাশে-বাতাসেও চির অম্লান হয়ে থাকবেঃ ‘এসো হে বৈশাখ এসো এসো/তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে/বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক--/মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা/অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।’ একই সাথে বিদ্রোহী কবি নজরুলের সেই দৃপ্ত আকাঙ্খাঃ ‘তোরা সব জয়ধ্বনি কর/তোরা সব জয়ধ্বনি কর/ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবৈশাখীর ঝড়---তোরা সব জয়ধ্বনি কর।’ অমর হোক বৈশাখী মেলা এই প্রার্থনাই করি। সুস্বাগতম বৈশাখ ১৪১৯।

arifurk2004@yahoo.com.au